গল্প

তমসা বৃত্ত

আহমেদ সাবের

-১-

যদিও শরৎ, তবুও বৃষ্টির বিরাম নাই গত কদিন ধরে। ঝরছে তো ঝরছেই। মনে হয় আকাশটার কোথাও একটা চিরস্থায়ী ফুটো হয়ে গেছে। সে ফুটো দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে অবিরাম ধারায়। বছরের এ সময়টা বড় কষ্টে যায় সুরুজ আলীদের। ক্ষেতের কোন কাজ থাকে না। বৃষ্টি বলে অন্য কাজও কেউ করাতে চায় না। ভরা পানিতে মাছও ধরা পড়ে না। সুরুজ আলী ছোট খালের মুখে একটা জাল পেতেছিল গত রাতে। ভোরে গিয়ে দেখে, মাছ তো লাগেইনি, তার যায়গায় একটা ধোড়া সাপ আটকে আছে। দু দিন আগে দশ বছরের মেয়ে হাসু দুপুর বেলা কিছু কচু পাতা তুলে এনেছিল। জরিনা এ বাড়ি ও বাড়ী খুঁজে চারটে ক্ষুদ চেয়ে এনে কচুর শাক দিয়ে রান্না করেছিল সন্ধ্যে বেলা। ছয় বছরের ছেলে জয়নাল আর দু বছরের ইমরান বড় তৃপ্তি করে খাবার পর যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু হাসুর পাতে তুলে দিতেই চোখ তুলে প্রশ্ন করে সে, তোমরা খাইবা না মা?

তুই খাইয়া ল। আমরা পরে খামুনে। হাসুর মা উত্তর দেয়।

হাসু যেন ব্যাপারটা ধরতে পারে। আমার এত লাগবো না, বলে প্রায় পুরোটাই তুলে রাখে সে। সেটা স্বামী-স্ত্রী ভাগ করে খেয়েছে রাতের বেলা।

একটুকু খাবারে পেটের এক কোনাও ভরে না সুরুজ আলীর। কেরোসিনের অভাবে বাতি জ্বলে না। করার মত কোন কাজও নাই। তাই বিছানার আশ্রয় নেয় সে। আর শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। ওর গলায় চুকা ঢেকুর উঠে। ক্ষুধায় পেট মোচড়ায় কেঁচোর মত। ওর জীবন যেন জলবিহারী কচুরীপানার জীবন। কিন্তু এমন তো হবার কথা ছিল না। ওর ঘর ছিল, জমি ছিল, পেশীতে শক্তি ছিল, সংসার ছিল, স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এই সুখী নদী ওর সমস্ত সুখকে ধ্বংস করে দিল। নদী পাড় ভাঙল আর এক রাতের মধ্যে ওর জমি জিরাত, ঘর বাড়ী গ্রাস করে ওকে পথের ফকির করে দিল। শুরু হলো স্থান থেকে স্থানান্তরে ভেসে থাকার জীবন। অনেক বছর পরে নদী জমি ফেরত দিল বটে, কিন্তু সে জমিতে সুরুজ আলী আর ফিরে যেতে পারলো না। কোন গঞ্জের কোন কেরানীর কোন এক কলমের একটা খোঁচায় নিজের জমিতে ওর ফেরবার রাস্তা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। জমির মালিক এখন আরেকজন।

সুখ নগরের সুখী নদীর পারের গজিয়ে উঠা নতুন চরে অন্যের জমিতে ওর সামান্য আশ্রয় মিলে। খড়ের চালের ছোট্ট একটা ঘরে পাঁচ পাঁচটা মানুষের বসত। বর্ষায় জমি জমা সব ডুবে আছে পানির নীচে। পানি কমে গেলে ক্ষেতের কাজ শুরু হবে। তার এখনো মাস খানেক বাকী। কিন্তু পোড়া পেট কি আর তা মানে? সে তো আর ঘড়ি ধরে চলে না। সুরুজ আলী ভাবে আর ভাবে। এভাবে কতদিন আর চলা যায়?

ছোট ছেলে দুটো সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করে খাবারের জন্য। হাসুর বুঝ হয়েছে বলে সব বুঝতে পারে সে। কষ্ট করে ক্ষুধা সহ্য করে; মুখে কিছু বলে না। অভাবের তাড়নায় জরিনার মেজাজ দিন দিন খারাপের দিকে গড়ায়।

খোলা দরজা দিয়ে নদীর হাওয়া আসে শো শো করে। বাইরে হাসু দুই ভাইকে কুমীর আর শেয়ালের কিসসা শোনায় চাঁদের আলোয়। দুরে ব্যাঙ ‘এর ডাক শোনা যায়, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। জরিনা দাওয়ায় অনেক দুরের নদীর দিকে মুখ করে বসে থাকে, উদ্দেশ্যবিহীন।

হাসুর মা। যতটা সম্ভব স্বরটা নমনীয় করে জরিনাকে ডাকে সুরুজ আলী।

কি লাগবো, কন? দাওয়া থেকেই উত্তর দেয় জরিনা।

এখানে আস। এক খান কামের কথা আছে।

অনিচ্ছা স্বত্বেও উঠে আসে জরিনা। কি, কন। কাছে এসে বলে সে।

দেশে ত কাজ কাম নাই। ভাবতাছি একবার ঢাকা যাইয়া দেখুম। বলে সুরুজ আলী।

জরিনার প্রাণটা ছ্যাঁত করে উঠে। এই বুঝি লোকটা পালাবার ফন্দি করছে। ঢাকায় আপনেরে কাম দিবো কে? মুখে বলে সে। আর ঢাকা যাওনের ট্যাকা পাইবেন কই?

ঠিকই কইছ হাসুর মা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুরুজ আলীর।

দু জন অন্ধকারে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। হাসুটারে যদি একটা ভালা বাড়ীত দিতে পারতাম, না খাইয়া আর কষ্ট পাইতো না। নীরবতা ভেঙ্গে আমতা আমতা করে বলে সুরুজ আলী।

দেশে বড় অভাব। ওরে রাখবো কে? জরিনার কণ্ঠে নিরাশার প্রকাশ।

দেশে না, ঢাকায়। মতি ভাইরে কইলে পাত্তা লাগাইতে পারতো।

বইলা দেখেন। এলেবেলে করে বলে জরিনা। ভদ্র লোকের বাড়ি হইলে ক্ষতি কি। আমার মাইয়ার যেন কষ্ট না হয়। আপনে ভালা কইরা খোজ খবর নিয়েন কথা দেওনের আগে। আমার আদরের মাইয়া। বলে মুখে চোখে আচল দেয় সে।

আগে অনেক বার কথাটা বলেছে সুরুজ আলী; কিন্তু জরিনা রাজী হয় নাই। অভাবে কি না করতে পারে। মনে মনে ভাবে সে। হাসু কি আমার মাইয়া না? বলে মুখে।

আবার নীরবতা। বলবে কি বলবে না ভেবে ভেবে অবশেষে কথাটা বলেই ফেলে সুরুজ আলী। আসলে কথাডা কি হাসুর মা, মতি ভাই কইছিল ..... তাইনে গত সপ্তায় ..... তাইনের পরিচিত এক ভদ্দর

লোকের বাসার লাইগা হাসুর কথা কইছিল। তোমার মনে কষ্ট লাগবো বইলা তোমারে কই নাই। কি করবা কও। না খাওয়াইয়া মাইয়াডারে মাইরা ফালানের থেইকা কারও বাসায় কামে দেওন কি ভালা না?

উত্তরে জরিনা কিছু বলেনা। কান্নার গমকে শরীরটা শুধু ফুলে উঠে ওর।

-২-

পরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে যায় সুরুজ আলী। মতি ভাইরে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। সকালের ট্রেনে তার ঢাকা যাবার কথা আছে। সুখ নগর, নয়ন কান্দি। তারপর তারা গঞ্জ। নদীর তীর ধরে হেটে গেলে মাইল চারেক পথ, ঘণ্টা খানেকের পথ। নৌকায় গেলেও ঘণ্টা খানেকের ধাক্কা। তবে হেটে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। দেখে, হাসু দুই ভাই ‘এর মাঝখানে তখনও শুয়ে। ইমরান গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে ওর। প্রাণটা হু হু করে উঠে সুরুজ আলীর।

মতি ভাইরে কইয়েন, টাকা পয়সা যাই দেক, আমার মাইয়াডারে যেন কষ্ট না দেয়। গুন গুন করে বলে জরিনা।

কমু।

দুই ঈদে যেন বাড়ীত আসতে দেয়।

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে সুরুজ আলী। তার পর বেরিয়ে পড়ে তাড়া হুড়া করে।

মতি মিয়াকে ঢাকার ট্রেন আসার আগেই ধরে ফেলে সুরুজ আলী।

আমার ট্রেন আসবার সময় হইয়া গেছে। মতি মিয়ার গলায় ব্যস্ততার সংকেত। সোজাসুজি কইয়া ফালাও, আমার কথায় রাজী থাকলে এই পাঁচ শ টাকা রাখ এখন। টেবিলের উপর পাঁচটা এক শ টাকার নোট রাখে মতি মিয়া। কাইলকা হাসুরে লইয়া আসবা। একটু আগে ভাগে আসবা। বাকী কথা কাইলকা হইবো। বলে মতি মিয়া উঠে দাঁড়ায়। তোমারে ত কইছি, তোমার মাইয়া সুখে থাকবো। আমার সময় নাই।

সুরুজ আলী সঙ্কোচ করে। তার পর একটা একটা নোট টেবিলের উপর থেকে তুলে নেয় অন্য দিকে তাকিয়ে। ওর চোখের কোনে দু ফোটা অশ্রু টলমল করে।

মতি মিয়া চলে যেতেই বাজারে ঢুকে সুরুজ আলী। দুই কেজী চাল কিনে। কিছু তরি-তরকারী। অন্যান্য টুকিটাকি। একটা ইলিশ মাছ কিনে ছোট দেখে। হাসু পছন্দ করে। মনিহারী দোকান থেকে একটা মালা কিনে। কত সখ ওর মালা পরার। একটা সালোয়ার কামিজ কেনার ইচ্ছা হয়। দর দাম করে। কিন্তু পয়সায় কুলায় না। তার পর আর দেরী না করে ফেরী নৌকায় উঠে বসে। নৌকায় আরো চার জন

লোক। ওরা ওদের মধ্যে আলাপ জুড়ে দেয়। সুরুজ আলী এক পাশে চুপ করে বসে ভাবনার ডানা মেলে।

মতি মিয়ার সাথে বছর খানিকের পরিচয় সুরুজ আলী। ইট কিনতে সুখ নগর এসেছিল। নৌকায় ইট উঠিয়ে দেবার কাজ করেছিল সে। মতি মিয়া যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল, কাজের প্রয়োজন হলে তারা গঞ্জে ওর সাথে যেন দেখা করে। কথা মত সুরুজ আলী তারা গঞ্জ গিয়ে দেখা করেছে কয়েকবার। টুক টাক নৌকায় মাল তোলার কাজও করেছে। তবে লোকটার যে পেশা কি, সেটা আজও জানতে পারেনি সে। কেউ বলে ঠিকাদার, কেউ বলে আড়তদার। কেউ বলে পাটের দালাল। লোকটার ব্যবসা কি, সুরুজ আলীর জানবার দরকার কি? আদার ব্যাপারীর কি জাহাজের খবর নেবার দরকার আছে?

গত সপ্তাহে আবার সে এসেছিল মতি মিয়ার কাছে কাজের খোজে। বাইরে বৃষ্টির তোড়জোড়। ভেতরে বসে মতি মিয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুরুজ আলীর পরিবারের খবর নিলো। তারপর বললো, এই বর্ষায় ত কাজ কাম পাওয়ার আশা নাই। মাইয়াডারে বাড়িত বসাইয়া রাইখা ফায়দা কি? তার থেইকা, ওরে একটা কামে লাগাইয়া দেও।

সেদিনের কথা শেষ হলেও চিন্তা শেষ হয়নি সুরুজ আলীর। কথাটা কি করে কথাটা সে বলবে জরিনাকে?

হঠাৎ ধুপ করে একটা শব্দ হলে চমকে উঠে সুরুজ আলী। ওর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। নদীর পাড় ভাংছে। ফেরী নৌকা কালা ঘূর্ণির যায়গাটা পার হচ্ছে নদীর একেবারে পাশ ঘেঁষে। এ যায়গাটায় সব নৌকা মাঝ নদী এড়িয়ে চলে। এখানটায় একটা বাঁক আছে। তাই, স্রোত বেশী থাকলে নদীর মাঝখানে বিরাট ঘূর্ণি হয়। লোকে বলে কালা ঘূর্ণি। গত বছর এই যায়গাটায় একটা নৌকা ডুবে গিয়েছিল কালো ঘূর্ণির আবর্তের গ্রাসে। সুরুজ আলী মাঝ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। ওর বুকের মাঝেও এক বিশাল ঘূর্ণি উঠে।

-৩-

কথামত হাসুকে আজ সকালে পৌঁছে দিয়েছে সুরুজ আলী মতি মিয়ার কাছে। না, কাঁদেনি হাসু। ট্রেনে উঠে বসেছে মতি মিয়ার সাথে। ওর চোখের ভাষাটা পড়তে পারেনি সুরুজ আলী। হাসুর চোখে কি দুঃখের কান্না ছিল, না স্বজন হারানোর বেদনা, না ওকে পরিত্যাগ করার জন্য ঘৃণা, না মুক্তির আনন্দ? সুরুজ আলী অনেক কথাই ভেবে রেখেছিল, ট্রেন ছাড়ার মূহুর্তে মেয়েকে বলবে। হাসু জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জানালায় বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই আর সে করতে পারলো না। মনের সব কথাগুলো যেন কোন মন্ত্রবলে কর্পূর হয়ে উড়ে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিল হুইসিল বাজিয়ে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাসু এবং শেষে ট্রেন ও। সুরুজ আলীর আর কিছু মনে নেই। সম্বিত ফিরে পেলে সে দেখলো, শূন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সে - একা। একেবারেই একা।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। বাইরে রোদের তেজ বেশ কড়া কয়েকদিনের বৃষ্টির পর। সুরুজ আলী লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাড়িতে যাবার তাড়া তো নেই।

দুপুরের পর বাড়ীতে ফিরে আসে সুরুজ আলী। এতক্ষণ অভুক্ত। তার খাবার ইচ্ছেও নেই। কোন যাদু বলে ওর ক্ষুধা তৃষ্ণার চাহিদা সব উবে গেছে। ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। কিন্তু ভাল লাগেনা। বেরিয়ে আসে এক সময়। নদীর পারে ক্ষেপার মত ঘুরে বেড়ায়। গালাগালি করে নদীকে। দেখতে দেখতে অন্য দিনের মত বিকাল হয়, সন্ধ্যা নামে।

জয়নাল আর ইমরান কতক্ষণ থেকে ক্ষুধা লাগছে, খাইতে দেও বলে কান্না জুড়েছে। দুপুরে ওরা কালকের বাসী ভাত খেয়েছিল। জরিনা কিছু খায়নি। ওর খেতে ইচ্ছে করেনি। ভাত রান্না করা দরকার। কিন্তু জরিনার উঠতে ইচ্ছা করছেনা। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আছে। হয়তো মনই শরীরকে চালায়। তবু এক সময় উঠতে হয়। চুলা ধরিয়ে ভাত চড়ায় সে।

হায়রে ভাত, তোর লাইগা আমার মাইয়াডারে পর কইরা দিলাম। জরিনার বুকের মাঝে গুমরে গুমরে কান্নার বেগ উঠে। আল্লারে, আমার হাসুরে আবার কবে আমারে দেখাইবা? ঘরের পেছনের অন্ধকারে ঢুকরে কেঁদে উঠে জরিনা। কতক্ষণ সময় কাটে জানে না সে। একসময় ভাতের কথা মনে পড়তেই ছুটে আসে সে চুলার কাছে। পোড়া গন্ধটাই নাকে আসে প্রথম। তাড়াতাড়ি চুলা থেকে পাতিলটা নামায় সে। পাতিলের সব পানি শুকিয়ে গেছে। তলার দিকের ভাত গুলো পুড়ে গেছে। তবু উপরের দিকের ভাত গুলো এখনো ঠিক আছে বলে রক্ষা। ইলিশ মাছের মাথাটা আধা জ্বাল রেখে দিয়েছিল আজ রাঁধবে বলে; কিন্তু ইচ্ছা করে না। কিছু বাসী তরকারী ছিল। তা দিয়ে দু ছেলেকে খাইয়ে দেয়।

আর রাত হতেই সুরুজ আলীর প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। বাড়ীতে ফিরে আসে সে। ভাত বাড়। হুকুম করে সে। জরিনা অনেক বেছে বাদ সাদ দিয়ে মোটামুটি খাবার যোগ্য ভাতগুলো প্লেটে বেড়ে দেয় তাকে। ভাতের পাশে একটা কাঁচা মরিচ, আর একটুকু নুন। পোড়া ভাতের বদ গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা লাগে ওর। থাকস কই? ভাত পোড়াইছস ক্যান? কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে সে। জরিনা বোবার মত চেয়ে থাকে। সালুন কই? ইলিশ মাছের মাথা কি করছস? একই কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুরুজ আলী।

জরিনা নিঃশব্দে উঠে হেটে যায় চুলার পাশে। একটা প্লাষ্টিকের বাটিতে রাখা ইলিশ মাছের আধা জ্বাল দেওয়া মাথাটা বাটি শুদ্ধ এনে ঠক করে রাখে সুরুজ আলীর প্লেটের পাশে। খান, আপনার মাইয়ার মাথা খান। বলে উঠে চিৎকার করে।

সুরুজ আলী রাগে অন্ধ হয়ে যায়। লাফ দিয়ে উঠে সে। চুলা থেকে একটা নিভে যাওয়া লাঠি টান দিয়ে উঠিয়ে পিটাতে শুরু করে জরিনাকে। ভয়ে দুই ছেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। জরিনা পায়ের দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুজে অনড় হয়ে মার সহ্য করে। এক সময় ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে হাতের লাঠি ছুড়ে ফেলে বাইরে নদীর দিকে লম্বা পা ফেলে হেটে যায় সুরুজ আলী।

সুরুজ আলী নদীর পাড়ে বসে থাকে। এক সময় জয়নাল এসে বসে ওর পাশে। ওর মুখে কথার খই। বাপজান, মেঘ গুলান কই যায়? পাখী গুলান আকাশে উইড়া গেলে মেঘের লগে ধাক্কা খায় না? নদীতে

এত পানি, আসে কোন খান থেইকা? আর যায় কোন খানে? সুরুজ আলী কোন কথা বলে না; বা ওর কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না? একটা পাখীর ঝাঁক ধনুকের মত কোথা হতে এসে উড়ে যায় ওদের মাথার উপর দিয়ে। জয়নাল একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে। আর সুরুজ আলীর চোখ জলের বুকে কোঁচের মত বিধে থাকে। মিয়া বাড়ীর বাঁশ বাগানের ফাঁক দিয়ে চাকার মত একটা বিরাট চাঁদ লাফিয়ে উঠে আকাশে। বাপের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এক সময় বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যায় জয়নাল। এবং সুরুজ আলী একাই বসে থাকে।

পূর্ণিমার চাঁদটা আস্তে আস্তে মাথার উপর আসতে থাকে গুটি গুটি পায়ে। নদীতে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে শো শো শব্দ করে। সুরুজ আলী উঠে এক সময় হাটতে শুরু করে নদীর পাড় ধরে। রশিদ মুন্সির বাড়ীর সামনে ওদের ডিঙ্গি নৌকাটা বাধাই ছিল। এ নৌকাটা বিপদে আপদে ধার নেয় সে। এখন অনেক রাত, বিশেষ করে গ্রামের হিসেবে। সুরুজ আলী নৌকাটা টেনে জলে নামায় আর পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশের পথে। বাউল বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে নিতাই বাউলের গান শুনে -

সুখ নগরে বসত আমার, সখী নদীর কুলে ।
উথাল হাওয়া লাগল এসে আমার আউলা চুলে।
ভরলো আকাশ জগত জোড়া, শীশার বরন মেঘে,
গুরু গুরু ডাকলো রে ঢাক, আসলো হাওয়া বেগে,
ভাঙ্গলো আমার সাধের বসত, মিশলো মাটির ধুলে। .....

সুরুজ আলী যেতেই থাকে, থামে না। আকাশের বিশাল চাঁদটা মাথার উপরে এসে যায়। শরতের মেঘের পাল ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়ায় আকাশময়। ওর ক্লান্তি লাগে। লগিটা পাশে রেখে নৌকায় টান হয়ে শুয়ে পড়ে সে। আকাশের চাঁদটা তাকিয়ে থাকে সুরুজ আলীর চোখের দিকে।

-৫-

নৌকাটা নিজের মত চলতে থাকে স্রোতের টানে। হাসুর কথা মনে পড়ে সুরুজ আলীর। সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, বাপজান, মায় কইছে আল্লা নাকি সক্কলের লাইগা খাবার দিয়া রাখছে। তয়, আমাগো খাবার গেল কই? প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেনি সে। আজ হঠাৎ করে উত্তরটা মনে পড়ে যায় ওর। মারে, আল্লায় সকলের লাইগা খাবার দিয়া রাখছে, কথাটা ঠিক। তয়, কেউ বেশী খাইয়া ফেললে অন্যের ভাগে টান পইড়া যায়। যেমুন আমাগো ভাগের টা আমিন ব্যাপারী নকল দলিল কইরা খাইছে বইলা আমাগো ভাগে টান পইড়া গেল।

ক্লান্তিতে সুরুজ আলীর তন্দ্রা পায়। এক সময় তন্দ্রার ঘোরেই হয়তো দেখে, আকাশটা নীচে নেমে এসেছে। চাঁদের মুখটা কোন যাদুর বলে হাসুর মুখ হয়ে যায়। হাসুর চোখে হাজার প্রশ্ন খেলা করে। বাপজান, আমারে বিদায় দিবার কালে আমারে একটু আদর করলা না ক্যান? আমার কত ইচ্ছা হইতাছিল, ট্রেন থেইকা নাইমা তোমারে জড়াইয়া ধরি। আমি জানালায় বইসা ছিলাম। তোমার দিকে হাত বাড়াইলাম তোমার হাতটা ধরনের লাইগা। তুমি আমার হাতটা ধরলা না ক্যান? কি আমার অপরাধ, বাপজান?

তোর মত ফেরেশতারে ছোঁয়ার অধিকার আমার নাইরে মা। ঢুকরে কেঁদে উঠে সুরুজ আলী। আমি পাপী, একটা বিরাট পাপী। তোর মারে, তোরে আমি ঢাকার বাসার কামে দেওনের মিছা কথা কইছি। টাকা লইয়া মতি মিয়ার কাছে তোরে আমি সারা জীবনের লাইগা বেইচা দিছিরে মা। যেই নোংরা হাত দিয়া টাকা নিছি, সেই হাত দিয়া আমি তোর মত ফেরেশতারে ছুঁই কি কইরা? তোর কাছে যে মাফ চামু, সেই মুখ আমার নাই রে মা।

সুরুজ আলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সারা নদী চাঁদের আলোয় ফক ফক করে। দূরে কালো ঘূর্ণির দিকে চোখ পড়ে ওর। কেউ যেন বিশাল পাতিলে ডাল ঘুঁটছে অদৃশ্য ঘুঁটনি দিয়ে। চাঁদের আলোয় পানির ছিটা গুলো চকমক করছে তারা বাতির মত। শব্দ হয় শো শো করে।

মারে, জানিনা তোরে কই লইয়া যাইবো মতি মিয়া - কইলকাতা, বোম্বাই, করাচী, লাহোর, না কি দুবাই। বিড় বিড় করে বলতে থাকে সুরুজ আলী। যেখানেই থাকস মা, আল্লায় যেন তোরে ক্ষুধার কষ্ট না দেয়। আমার এইখানে ত কষ্ট কইরা গেলি সারা জীবন। ক্ষুধার কষ্ট বড় কষ্টরে মা। মানুষ কে অমানুষ বানাইয়া ফালায়।

এক খণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দেয় ধীরে ধীরে। সুরুজ আলী আকাশের দিকে তাকায়। সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে কোন সময়। নৌকাটা কালো ঘূর্ণির কাছে চলে এসেছে নিজে নিজেই। পানির শব্দে কানে তালা দেয় ওর। নৌকাটাকে উল্টো দিকে চালিয়ে পাড়ের কাছে নেওয়া দরকার। কিন্তু সুরুজ আলী গা করে না। অতশত না ভেবে, চোখ মুদে আকাশের দিকে মুখ করে নৌকায় শুয়ে থাকে টান টান করে।

সিডনী ২৬ আগষ্ট, ২০১১